SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Special Issue, (December) 2025

আধুনিক কবি শ্রীজীবের রচনায় সন্তান প্রতিপালনে পিতার ভূমিকা— একটি অধ্যয়ন

Aindrila Aich
Research Scholar
The University of Burdwan
Purba Bardhaman, West Bengal, India.
Email: aindrilaaich2014@gmail.com

Abstract: মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। পরিবার হল, ভারতীয় সমাজজীবনের মূল একক। সেই পরিবারের বৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন হয় 'প্রজন্মে'র। প্রজন্ম বৃদ্ধি, 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রয়োজন— একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সন্তান, পিতামাতারই প্রতিবিম্ব সদৃশ— যে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক পরিবারের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে থাকে। সন্তানের আগমন একটি যুগলের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। সন্তানের আগমনের কারণে কেবল পরিবারের সংখ্যাই বৃদ্ধি হয়না, উন্মোচিত হয় এক নতুন ভবিষ্যত সম্ভাবনার। সন্তান— পুত্র বা কন্যা, যাই হন না কেন, সে পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ; তার হাত ধরেই পরিবারে ভাবী সময়ের অর্থ, মান বা যশের আগমন ঘটবে- এমনটাই প্রত্যাশিত। তবে সেই কিশলয়টির মহীরূহে পরিণত হতে প্রয়োজন হয় অসীম যত্নের; তাই স্বাভাবিকভাবেই সন্তান লালন-পালনে পিতামাতাকে অপরিসীম ভূমিকা পালন করতে হয়। শিশুর দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা'ই বেশী পালন করে থাকেন, মায়ের তুলনায় বাবার ভূমিকা সেখানে যৎসামান্য। সংস্কৃত সাহিত্যের বিংশ-শতকের কবি শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ তাঁর 'দরিদ্রদুর্দৈবম্' এবং 'রাগবিরাগম্' নামক প্রহসন দুটিতে বেশ দৃঢ়ভাবে আলোচ্য বিষয়টি ব্যঙ্গ্যাত্মকভাবে উত্থাপন করেছেন। গবেষণা প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য— আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে single parenting-শব্দটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। সন্তান প্রতিপালনে, শ্রীজীবের রচনালোকে কেবলমাত্র পিতার গুরুত্ব ও ভূমিকা বিষয়টি কতটা প্রাসঙ্গিক তার মূল্যায়ণ করা।

Keywords: শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, সন্তান প্রতিপালন, শিশু মনস্তত্ত্ব, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য, প্রহসন।

প্রাচীনভারতে সমাজব্যবস্থা সামাজিকগণের জীবনকেও চতুরাশ্রম প্রথার দ্বারা সুশৃঙ্খলময় করে তুলেছিল। এগুলি হল- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে বিদ্যালাভ সমাপনান্তে গার্হস্থ্যশ্রমের দ্বারা সংসার ধর্ম পালন করতে হত। আর সেই গার্হস্থ্য ধর্মের সূচনা হত 'বিবাহ' নামক সংস্কার বিশেষের মাধ্যমে; 'বিবাহ' তাই প্রাচীনকাল থেকেই গৃহী জীবনের মূলভিত্তি। অর্থশাস্ত্র প্রণেতা আচার্য কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থের 'ধর্মস্থীয়ম্' নামক তৃতীয় অধিকরণে বিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বলেছেন— 'विवाहपूर्वो व्यवहारः'[1] অর্থাৎ ব্যবহার সকলের মধ্যে বিবাহই প্রথম। 'विशेषेण वहनं विवाहः'[2]-অর্থাৎ 'বিবাহ' অর্থে বিশেষ প্রকারে অথবা কন্যাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। সেই প্রাচীন সময় থেকেই বিবাহের উদ্দেশ্যরূপে বলা হয়েছে— নরনারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ধর্মাচরণ করবে, সন্তানোৎপাদনের দ্বারা বংশরক্ষা করবে এবং স্বর্গলাভের অধিকারী হবে—

'अपत्यं धर्म्मकार्य्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा।
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह।।'[3]

অতএব, সেই বৈদিকযুগ থেকে অদ্যাবধি বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, সন্তানোৎপাদনের দ্বারা বংশবিস্তার। প্রজন্ম বৃদ্ধিতে স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকা সমান হলেও সন্তান প্রতিপালনে পিতার থেকে মাতার অবদান স্বভাবতই অধিক। অন্যদিকে পুরুষজাতি স্ত্রী-সন্তানাদির প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে জীবন-জীবিকার ঘোড়দৌড়ে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অতটাও সক্রিয় নন; পরিবার ও পরিজনের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন পূরণে সদা সচেষ্ট বাবার কাছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানের শৈশবস্মৃতির মূহুর্ত অধরাই থেকে যায়। কেননা, শাস্ত্রমতে, সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ পুরুষ

নিন্দাযুক্ত হয়ে থাকেন।[4] সন্তানের কাছে মায়ের সাহচর্য্য অত্যন্ত সুলভ হবার কারণে মা'ই সন্তানের ত্রাণস্বরূপা ও প্রিয়া হয়ে উঠেছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে তো মাতৃমূর্তিকেই সংসারের 'পরমগতি' বলা হয়েছে—

'নাস্তি মাতৃসমা ছায়া
নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ।
নাস্তি মাতৃসমং ত্রাণং
নাস্তি মাতৃসমা প্রিয়া'।।[5]

যদিও এর কারণ হিসাবে— চিরকালের তরে নারীর অস্বাতন্ত্র্য[6] ও পুরুষের প্রতি আনুগত্য, তাকে কেবল গৃহমুখী জীবনেই অভ্যস্তা করে তুলেছে। আধুনিককালে অর্থাৎ বিংশশতকের মধ্যবর্তী সময় অবধিও এরূপ ব্যবস্থাতেই অধিকাংশ স্ত্রীরা স্বচ্ছন্দবোধ করে থাকতেন। কিন্তু বিংশ শতকের শেষভাগ থেকে এমত চিন্তাভাবনার পরিবর্তন, ক্রান্তদর্শী কবি শ্রীজীবের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই তিনি বিনোদনোপযোগী প্রহসন উপস্থাপনের দ্বারা আধুনিক পিতৃসমাজের কাছে কান্তাসম্মিত[7] সতর্কবাণী মধুপর্কের[8] ন্যায় ঘোষণা করলেন।

শ্রীজীব রচিত রাগবিরাগম্ এবং দরিদ্রদুর্দৈবম্— প্রহসনদুটির মধ্যেই কেবল সন্তান চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্রদুর্দৈবম্- এ ষড়ানন ও লম্বোদর নামক বালকদ্বয়ের পিতা হলেন নায়ক বক্রেশ্বর। বালকদুটির মায়ের নাম- মন্দোদরী, যিনি বক্রেশ্বরের দ্বিতীয়া পত্নী। রাগবিরাগম্-এ 'বিরাগ' দেশের রাজার দুই সন্তান, তারা রাজকুমার ও রাজকুমারী— বয়সে তারা কিশোর-কিশোরী কিংবা আশুযৌবন। রাজার পত্নী অর্থাৎ রাণীর কোনোপ্রকার নাম বা প্রসঙ্গ উল্লেখ প্রহসনটি পাওইয়া সম্ভব হয়নি। সাধারণভাবে কিশোরী বা যুবতী মেয়েরা তাদের ব্যক্তিগত আলোচনা মায়ের সাথে আলোচনা করতেই সাবলীল; সেখানে বাবার কাছে তার কিশোরীমনের ভাবাবেগ অনিয়ন্ত্রিতভাবেই প্রকাশ পেয়েছে—

'উপস্থিতেঽপি মে বয়ঃকালেঽনুরূপব্যবস্থা নোপদিশ্যতে।'[9]

তবে রাজকুমারীর এপ্রকার অনুযোগবাক্যে সে মাতৃহীন, এমত অনুমিত হয়। রাজকুমার কি রাজকুমারীর সহোদর, কি বৈমাত্রেয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

শ্রীজীব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রহসনদুটিতে সম্পূর্ণ পৃথক অর্থনৈতিক অবস্থাপন্ন দুজন পিতাকে উপস্থাপিত করেছেন— একজন ভিক্ষাজীবী বক্রেশ্বর, অন্যজন স্বয়ং বিরাগরাজ। তবে দুজনেই পিতারূপে আপন সন্তানের পক্ষে উপাদেয় নন। কেউ সন্তানের ক্ষুৎপিপাসা মেটাতে অপারগ, কেউ আবার সন্তানকে মানসিক আশ্রয় দিতে অসমর্থ।

কবি পিতাদের সতর্ক করলেন, সন্তান প্রতিপালন কেবল অর্থোপযোগেই হয় না। অনুকরণ প্রিয় শিশু সর্বদাই পিতামাতার থেকে ভালোমন্দ উভয়ই আত্মস্থ করে। সন্তান মূলত পিতামাতার প্রতিরূপ। তাই সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার ভূমিকা কিছু বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সেগুলি হল—

ক) পিতা-মাতা সুসম্পর্ক
খ) স্বার্থহীন দায়িত্বজ্ঞান
গ) সন্তানের প্রতি অনুকম্পাবোধ
ঘ) সুনিশ্চিত আশ্রয়

এছাড়াও সন্তান প্রতিপালনে আনুসাঙ্গিক বহু চর্চাযোগ্য বিষয় রয়েছে। তবে, আলোচ্য প্রহসনদুটির সাপেক্ষে উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করছি—

ক) পিতা-মাতার সুসম্পর্ক—

সন্তানের জীবনে অতিপ্রিয় ব্যক্তিটি হল তার মা। মায়ের প্রতি অত্যাচার, অবিচার হতে দেখলে সন্তান নিজেও নিজেকে অসুরক্ষিত মনে করে। বাবা-মায়ের সমৃদ্ধ সম্পর্ক সন্তানকে প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত জীবন দানে সক্ষম হয়। সাধারণভাবে, দরিদ্রতা সংসারে দাম্পত্য কলহের প্রধান ও প্রথম

কারন। বক্রেশ্বর ও মন্দোদরীর জীবনেও এই অর্থাভাবই সংকটময় ক্ষয়শীল পরিস্থিতিতে পর্যবসিত হয়েছে। বক্রেশ্বর স্বভাব খল, প্রহসনের প্রস্তাবনাতেই সূত্রধার তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন— "निःस्वः खलस्वभावो वक्रेश्वरशर्मा..."[10] সে শারীরিকভাবে সক্ষম হলেও ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে অর্থোপার্জনে নিশ্চেষ্ট, শুধুমাত্র অলসতার কারণেই সে অন্য কোনো কাজে ইচ্ছুক নয়। বক্রেশ্বর তার পরিবারের অভিভাবক, সে একাধারে যেমন পিতা তেমনই সে মন্দোদরীর স্বামী। কিন্তু স্বামীর ঔচিত্যবশত কোনোপ্রকার ব্যবহার তার কাছে আশা করা যেন অন্যায়। স্ত্রী পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছে— ''एका गृहिणी मन्दोदरी सार्थकनान्मी राक्षसीव वचने भोजने च परमनिपुणा।''[11] সে স্ত্রীকে সে সন্দেহ করে, হয়ত বা মন্দোদরী তাকে লুকিয়ে কিছু খেয়েছে— 'गृहिणि! सत्यं वद किञ्चिद् भक्ष्यं सञ्चितं वर्तते?' মন্দোদরীকে সে বিয়ে করে শ্বশুরকুলকে সে বাধিত করেছে। তার এমত অর্থাবস্থার জন্যেও স্ত্রীই দায়ী, কারণ স্ত্রীভাগ্যেই তো লক্ষ্মীলাভ হয়—

"स्त्रीभाग्येन भवेल्लक्ष्मीः पत्युरित्युच्यते जनैः।
अहो! त्वद्भाग्ययोगेन दुर्भिक्षं न जहाति माम्।।"[12]

মন্দোদরীই তার হতভাগ্যের কারণ বলে সে মনে করে। স্ত্রীকে খাদ্য-বঞ্চনা দিতেও সে অপটু নয়—

"तिन्तिडीपत्रझोलेन भक्तं चलति पङ्कवत्।
यदि स्याद्व्यञ्जनं तत्र न जानेन्नगिरिं गिलेः।।"[13]

তার মতে, সে একা কেনো ভিক্ষা করে উপার্জন করে স্ত্রীপুত্রদের উদরপূর্তি করবে? ভিক্ষা করতে হলে সপরিবারেই ভিক্ষা করবে, তাতেই অধিক উপার্জন হবে-এমনই তার প্রত্যাশা। সে বিষয়ে স্ত্রীকে রাজি করার সময়ে তার মধুবাক্য যেন মন্দোদরীর অজানা নয়, তাই সে বিস্মিত হয়নি। মন্দোদরী বক্রেশ্বরের যোগ্য অর্ধাঙ্গিনী; ঝগড়ার মাঝে তাদের সন্তানদের ভরণপোষণ নিয়ে কথা উঠলে, সেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারলেই যেন বক্রেশ্বর নিস্কৃতি পায়। বাবা-মায়ের দ্বন্দ্বের সময় তাদের দুই সন্তান সম্মুখেই অবস্থান করছে। বাস্তবিকভাবেই তাদের মানসিক শান্তি অনুমেয়।

বক্রেশ্বরের মন্দোদরীর প্রতি আচরণ বাস্তবজীবনে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সকল পরিবারের যেন এক চেনা গল্প। প্রয়োজন সাধনে স্ত্রীর সাথে সদয়ভাব, অন্যসময়ে নির্দয়তা বেশীরভাগ পুরুষেরই নিত্তকর্ম।

এই পারিবারিক অশান্তির রেশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গ কাটিয়ে উঠতে পারলেও বাল্যকালে কিংবা কৈশোরে এমন মানসিক আঘাত সন্তানের মনকে ছিন্নভিন্ন করে তোলে।

খ) স্বার্থহীন দায়িত্বজ্ঞান—

সন্তান প্রতিটা দম্পতীর পরম আকাঙ্খিত বিষয়। সন্তানের কাছে পিতামাতা আকাঙ্খিত নয়, বরং পিতামাতাই পিতৃত্ব-মাতৃত্ব লাভের জন্য সন্তানের আকাঙ্খা করে থাকেন। জন্মের পরে সন্তান পিতামাতাকে প্রাপ্ত হয়ে তাদের মান্যতা স্বীকার করে বটে; তবে তা আবশ্যিক নয়। সন্তানের পিতামাতার প্রতি থাকে কর্তব্য, অর্থাৎ করণ যোগ্য বিষয়— তা না করলে পাতকী হবে বিষয়টা মোটেও এমন নয়। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতামাতা থাকেন দায়বদ্ধ। এ সম্পর্ক কিছুটা বৃক্ষের সাথে ফলের। বৃক্ষকে ফলের কিছুই দেয় থাকেনা, কিন্তু ফলের দ্বারাই বৃক্ষ পরিচিত হয়- তার অন্তর্হিত বীজ পরবর্তী প্রজন্মের কারক। কিন্তু বৃক্ষ পুষ্পাকারে ফলের সম্ভাবনাকে আনন্দের সাথে ঘোষণা করে এবং ফলের পরিস্পুটাকারে প্রকাশাবধি দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে। লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি লতাশ্রেণীর উদ্ভিদগুলিও তার তুলনায় বহুগুণে বৃহদাকারের ফলকেও পরম মমতায় অত্যন্ত যত্নে প্রতিপালন করে। এ যেন প্রকৃতির এক গুপ্ত নির্দেশের পরিণাম।

কিন্তু মনুষ্যসমাজ প্রকৃতিনির্দেশের বিপরীতে চলতেই বেশী স্বছন্দবোধ করে! স্ত্রী-সন্তানের মুখে অন্নার্পণ পুরুষের একান্ত দায়। তার প্রতিদানে সে কি পাবে?- এ ভাবনা সংসারোপযোগী নয়। স্বার্থে অন্ধ মনুষ্যকুল তাই পুত্রসন্তান জন্মালে আনন্দে মাতে, কন্যাসন্তানে দুঃখ পায়। তাদের

সাধারণ জ্ঞানে কন্যাকে বিবাহ দিয়ে তো পরের ঘরেই অর্পণ করতে হবে, তাতে তাদের লাভ কি? তাই কন্যারা আর 'সন্তান' হয়ে উঠতে পারেনা। সমাজের এ ধারণা যে শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয়। বক্রেশ্বরের তো দুটিই পুত্র সন্তান; তাতে পিপাসার্ত মুখ তো বক্রেশ্বরকে বিচলিত করতে পারেনি। বাবার কাছে খাদ্যের চাহিদা তো সঙ্গত, তবু তা পরিপূরণে অক্ষম হয়েও বক্রেশ্বর লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করেছে এমন নয়; অথচ নিজ পুত্রযুগলকে 'পাত্রেসমিতৌ'[14] বিশেষণে বিশেষায়িত করতে সে একবারও ভাবেনি। পুত্রের উদরপূর্ণতা সে খুশি নয়, তার ভক্ষিত বিষয় জানতেই সে বেশী উৎসুক! স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব এড়াতে সে গৃহত্যাগ করতে সংকল্প করে। ভিক্ষান্ন থেকে নিজের জন্য পৃথক ভাবে সে তণ্ডুলরাশি লুকিয়ে রাখে- এতে তার স্বার্থপর মনোভাব প্রখরভাবে প্রকাশ পায়।

শাস্ত্র বলে— 'পুরুষ একাকী পুরুষ বলে বিবেচিত হয়না; ভার্যা-আপনি এবং অপত্য যোগে পুরুষ সংজ্ঞা সার্থক হয়। পুরুষ একাকী সর্বদাই অপূর্ণ, ভার্যাযোগে তার পূর্ণত্বপ্রাপ্তি হয়। স্ত্রী ও তদুৎপন্ন সন্তান-এই তিনে মিলিতরূপে পুরুষ।'[15]

গ) সন্তানের প্রতি অনুকম্পাবোধ—

সন্তান সদ্যবিকশিত পুষ্পের মতো, সন্তানের শৈশব এক মধুরময় সময়। পিতা-মাতা উভয়েরই উচিত সেই সম্পদ সদৃশ সম্ভাবনাকে আগলে রাখা। তাদের বৃদ্ধি-বিকাশের প্রতি যত্নশীল মনোভাব পোষণ করা। সন্তানের বেড়ে ওঠার সময় তাদের প্রতি উদাসীন মনোভাব, তাদেরকে ভুলপথে নিয়ন্ত্রণ করে। অবস্থাপন্ন, ক্ষমতাশীল পিতার জীবনে চরম প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে, তাদের ক্ষমতা থেকে চ্যুত করতে সন্তানের স্পর্ধা তখন শত্রুর মতো প্রতীত হয়, যেমন বিরাগরাজের ক্ষেত্রে রাজকুমার। সঙ্গীতের প্রভাবে মনপরিবর্তন জনিত কারণে রাজকুমার একথাই তো সর্বসমক্ষে স্বীকার করেছেন— 'সাম্প্রতং কেষুচিদ্বিপথেষু ভবতো দুরাগ্রহং ধনলিপ্সা নিদর্শনং চ পরিজ্ঞায় ঘাতক দ্বারা ভবন্তমদ্যৈব গুরুহত্যয়া লোকান্তরং প্রেষয়িতুকামোঽভবম্। বিবেকদ্বন্দ্বমনুভূয়াপি সহচরাণামুত্তেজনয়া হত্যাকর্মণি কৃতনিশ্চয় আসম্।'[16] মন্দোদরীর কাছে যেমন পুত্রদ্বয় শাসিত হয়েছে, তেমন মায়ের কথায় তারা ইষ্টস্তুতিকে বেদবাক্যের মতো পালন করেছে। সন্তান পিতামাতার সম্পত্তি নয়, সম্পদ। তাদের উপর কর্তৃত্ব চলেনা, তারা বাবা-মায়ের দাস নয়; চলে এক ভরসাজনিত অধিকার। সে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় পিতামাতাকেই, কারণ যা আপনি শেখাবেন সন্তান তাই শিখবে, যা দেখাবেন সন্তান তাই দেখবে, যা জানাবেন তাইই সে জানবে। দুর্বলতা দেখিয়ে সবলতা আশা করা; অনুচিত নয়- তা মূর্খামি।

ঘ) সুনিশ্চিত আশ্রয়—

সন্তানের কাছে পিতামাতা সুনিশ্চিত আশ্রয়। সেই আশ্রয় যদি মানসিকভাবে ব্যহত হয়, তবে পিতামাতা জীবিত থাকতেও সে সম্পূর্ণরূপে অনাথ হয়ে পড়ে। ষড়ানন ও লম্বোদরের কাছে স্নেহশীলা, প্রেমময়ী মা মন্দোদরী ছিলেন কিন্তু রাজকুমার-রাজকুমারীর প্রাচুর্যময় জীবনে সেই আশ্রয়হীনতা অসৎ বন্ধুসঙ্গ কিংবা মন্ত্রীপুত্রের সংসর্গ এসে পড়েছে— তাতে ভবিষ্যতের চিন্তা কিংবা কলঙ্কের ভয় কোনো কিছুই ভাবনার মধ্যে আসেনি। রাজার উদাসীন মনোভাব যেন আজকের দিনে অর্থচিন্তামগ্ন পিতাগণের প্রতিরূপক।

দুর্ভাগ্যক্রমে কবি স্বয়ং বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগের যন্ত্রণা ভোগ করেন। পিতা পঞ্চানন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করলেও পুত্র শ্রীজীবের জীবনে তিনি এক অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিলেন। পিতৃগৌরবে মুখর পুত্রের আজীবন কর্মকৃতি যেন বৃক্ষের পরিচয় বহন করে গেছে। শ্রীজীবও পিতা ছিলেন, তাঁর পরিচয় বহন করেছেন তাঁর সন্তানগণ। পিতার ভূমিকা যে শ্রীজীবের জীবনে কি তীব্র ও সপ্রভিভ ছিল তা তাঁর প্রতিটা রচনান্তে পিতৃস্মরণের প্রতিটি অক্ষরে ছত্রে ছত্রে বিদিত। আদুনিক জনজীবনে অর্থশালী পিতারা কেবল সন্তানের মুখের প্রতিটি দাবীপূরণে সদাব্যস্ত। নির্ধন পিতারা তাদের জীবনের গ্লানিময় ক্লান্তি নিজের অজান্তেই সন্তানকে দিয়ে ফেলছেন। সন্তানের জীবনে নিজ-প্রভাব রাখছেন কতজন? আপনার সন্তান আগামী দিনে আপনার পরিচয়। তাকে

সম্পদের মতো ব্যবহার করুন—পিতৃসমাজের প্রতি এ যেন এক শ্রীজীবের নীরব পাঠ।

Endnotes

1. অর্থশাস্ত্র ৩/২/১।
2. কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়, হিন্দু বিবাহ কি উৎপত্তি ঔর বিকাশ, পৃ.ন. ৩২৮।পি.ভি.কানে, ধর্মশাস্ত্র কা ইতিহাস, পৃ.ন. ২৬৮।
3. মনুসংহিতা ৯/২৮।
4. তদেব ৯/৪।
5. মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৬৬/৩১।
6. মনুসংহিতা ৯/৩।
7. কাব্যপ্রকাশ ১/২।
8. রাগবিরাগম্, প্রস্তাবনাংশ। পৃ.ন. ১।
9. তদেব, পৃ.ন. ১৭।
10. দরিদ্রদুর্দৈবম্
11. তদেব
12. তদেব
13. তদেব
14. তদেব
15. মনু ৯/৪৫।
16. রাগবিরাগম্

Bibliography

- ভট্টাচার্য, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, *'দরিদ্রদুর্দৈবম্'*, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলকাতাঃ ১৯৬টা।
- -, *'রূপকচক্রম্',* অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্- শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা-কলকাতা: ১৯৭২।
- মনু, *মনুসংহিতা,* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলকাতা।
- মম্মট, *'কাব্যপ্রকাশ',* রামানন্দ আচার্য (সম্পা.), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা: ১৩৮৬ (বঙ্গাব্দ) (প্রথম সংস্করণ)।

———